বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) আজ ৩১ আগস্ট, ২০১৮ লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের অনুপম আদর্শ প্রসঙ্গে ধারাবাহিক খুতবা প্রদান করেন।

হুযুর (আই.) তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর বলেন, বদর যুদ্ধের একজন সাহাবী হলেন হযরত উমায়ের বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), তার পিতার নাম আবু ওয়াক্কাস মালেক ও মাতার নাম আমেনা বিনতে সুফিয়ান। তিনি হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের ছোট ভাই ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও শহীদ হন। মহানবী (সা.) তাকে ও হযরত আমর বিন মা'আযকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। সীরাত খাতামান্নাবীঈনে তার বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। মহানবী (সা.) মদীনা থেকে কিছুটা অগ্রসর হয়েই শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন, এরপর কমবয়সী যেসব ছেলে অতি-উৎসাহে চলে এসেছিল তাদের মদীনায় ফেরত পাঠান। হযরত উমায়ের এটি শুনে লুকিয়ে লুকিয়ে ছিলেন, কিন্তু শেষমেশ তার পালা আসে এবং মহানবী (সা.) তাকে ফেরত পাঠাতে বলেন। এটি শুনে উমায়ের কাঁদতে শুরু করেন, তা দেখে মহানবী (সা.) তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে দেন। তিনি তার বড় ভাই সা'দের কাছে বলেছিলেন, 'আমার শংকা হয় যে মহানবী (সা.) আমাকে দেখে শিশু মনে করে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু আমি যুদ্ধে যেতে চাই; হয়তো আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শাহাদাত বরণের সুযোগ দান করবেন।' তার তলোয়ার বেশ লম্বা ছিল, মহানবী (সা.) নিজ হাতে সেটিতে খাপ পরিয়ে দেন। বদর যুদ্ধে শাহাদাতের সময় বয়স ১৬ বছর ছিল।

দ্বিতীয় সাহাবী হযরত কুতবা বিন আমের (রা.)। তিনি আনসারী ছিলেন, পিতা আমের বিন হাদীদা ও মাতা যয়নব বিনতে আমর। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে, মতান্তরে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। আকাবার দু'টো বয়আতেই অংশ নেন। তিনি সেই প্রথম ছয়জন আনসার সাহাবীর একজন, যারা মক্কায় গিয়ে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেন। বাকিরা হলেন আবু উমামা আসাদ বিন জুরারাহ, অওস বিন হারেস, রাফে বিন মালেক, উকবা বিন আমের, জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)। তারা বয়আত করে ফেরার সময় মহানবী (সা.)-কে বলেন, গৃহযুদ্ধ আমাদেরকে অনেক দূর্বল করে দিয়েছে, 'আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক বিভেদ। আমরা গিয়ে ইসলামের প্রচার করব, হতেও তো পারে যে আপনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আবার ঐক্যবদ্ধ করে দিবেন, তখন আমরা আপনার সবরকম সহযোগিতা করতে পারব।' তারা যান ও তাদের প্রচারের ফলে সেখানে ইসলামের চর্চা শুরু হয়। হুযুর বলেন, যারা বলে ইসলামের ফলে আরবদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই সাহাবীরা আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ইসলামের মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক বিভেদ দূর হবে, আর তা-ই হয়েছিল। হযরত কুতবা দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। বদর, খন্দক, উহুদসহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন, সেদিন তার শরীরে নয়টি বড় আঘাত লেগেছিল। মক্কা বিজয়ের দিন তার গোত্র বনু সালামার পতাকা তিনিই বহন করছিলেন। তার ভাই ইয়াযিদ বিন আমের আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশ নেয়া সত্তরজনের একজন ছিলেন এবং বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

তৃতীয় সাহাবী হযরত শুজা বিন ওয়াহাব (রা.), পিতা ওয়াহাব বিন রবীআ। লম্বা, একহারা গড়নের লোক ছিলেন, মাথায় ঘন চুল ছিল। প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছরে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে মক্কাবাসীরা সব মুসলমান হয়ে গেছে– এই গুজব শুনে মক্কা ফেরত আসেন, এরপর আবার মদীনায় হিজরত করেন। মহানবী (সা.) তার ও অওস বিন খওলির মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

করেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশ নেন, চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। হুদাইবিয়া থেকে ফেরার পর মহানবী (সা.) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। হযরত শুজাকে গাসসানের গভর্নর হারেস বিন আবি শিমারের কাছে চিঠি দিয়ে দূত হিসেবে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে পৌঁছলেও রাজ-দরবারে যেতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি হারেসের নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে সবকিছু জানান। প্রধান রক্ষী সব শুনে আবেগাপ্লুত হন ও ঈমান আনেন, কিন্তু তার শংকা ছিল হারেস জানতে পারলে তাকে হত্যা করবে এবং সে ঈমান আনবে না, কারণ সে রোমান সম্রাট সিজারের ভয়ে ভীত। বস্তুত যখন হযরত শুজা হারেসকে চিঠি পৌঁছান, তখন সে রেগে-মেগে চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং মহানবী (সা.)-কে ধরে শাস্তি দেয়ার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতে বলে। সে সিজারের কাছে চিঠি লিখে সব কথা জানায়। ইতোমধ্যে হযরত দাহইয়া কালবী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিঠি নিয়ে সিজারের কাছে পৌঁছেছিলেন, তাই সিজার হারেসকে কড়াভাবে নিষেধ করেন। তখন হারেস হযরত শুজাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ফেরত পাঠান, আর প্রধান রক্ষীও তাকে অনেক উপহার-উপঢৌকন দেন ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিজের সালাম ও বয়আতের কথা পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। মহানবী (সা.) পুরো ঘটনা শুনে হারেসের ব্যাপারে মন্তব্য করেন, সে ধ্বংস হয়ে গেল। ৮ম হিজরীতে মহানবী (সা.) বনু হাওয়াজিনের একটি গোত্রের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য হযরত শুজার নেতৃত্বে চব্বিশজন মুজাহিদদের একটি দল প্রেরণ করেন। তারা অকস্মাৎ এই দলটিকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে যায়।

চতুর্থ সাহাবী হযরত শামাস বিন উসমান (রা.)। পিতা উসমান বিন শারীদ, মহানবী (সা.) তাকে হযরত হানযালা বিন আবি আমেরে সাথে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি একেবারে শুরুর দিকের মুসলমান ছিলেন। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'আমি শামাস বিন উসমানকে ঢালের মত দেখেছি।' মহানবী (সা.) পাথরের আঘাতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেদিকেই চোখ তুলে তাকিয়েছেন, হযরত শামাসকে তলোয়ার-হাতে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করতে দেখেছেন। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উহুদ থেকে মদীনা আনা হয়, সেখানে তিনি তার চাচাতো বোন হযরত উম্মে সালামার ঘরে শাহাদাত বরণ করেন, তিনি ৩৪ বছর বয়সে শহীদ হন। মহানবী (সা.) তাকে সেই পোশাকেই উহুদে নিয়ে দাফন করার নির্দেশ দেন।

পঞ্চম সাহাবী হযরত আবু আবস বিন জাবর (রা.)। জাহিলিয়্যাতের যুগে তার নাম ছিল আব্দুল উযযা, মহানবী (সা.) তা বদলে তার নাম রাখেন আব্দুর রহমান। তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরসহ সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, কা'ব বিন আশরাফের মৃত্যুদন্ড কার্যকরকারী দলের সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) তার ও হযরত হুনায়সের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। ৩৪ হিজরিতে ৭০ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়, হযরত উসমান (রা.) তার জানাযা পড়ান ও জান্নাতুল বাকীতে তিনি সমাহিত হন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশাতে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়, মহানবী (সা.) তাকে একটি লাঠি দিয়ে বলেন, 'এটি থেকে আলো নাও।' আর সেই লাঠি তার সামনে আলো সৃষ্টি করত। তিনি নিজের এলাকা বনু হারসা থেকে, যা প্রায় দুই-আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, মহানবী (সা.)-এর পিছনে নামায পড়ার জন্য আসতেন। তার আমানতদারির অবস্থা এমন ছিল– যখন মৃত্যুর আগে চরম অসুস্থতার মাঝে হযরত উসমান (রা.) তাকে দেখতে গিয়ে তার অবস্থা কেমন তা জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি জবাব দেন, সবই ভাল আছে, কেবল উট বাঁধার সদকার একটি রশি ছাড়া যা ভুলে আমি হারিয়ে ফেলি; এটির দায় থেকে এখনও মুক্ত হতে পারি নি।

ষষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু আকীল বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.), পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন সালওয়া। তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন। সকল যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন, দ্বাদশ হিজরিতে ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে

শহীদ হন। একবার মহানবী (সা.) সদকার জন্য আহ্বান করলে তিনি সারারাত জেগে পরিশ্রম করে যা পারিশ্রমিক পান, তা থেকে অর্ধেক নিজ পরিবারের জন্য রেখে বাকি অর্ধেক সদকা করেন, যার পরিমাণ ছিল প্রায় সেরখানেক খেজুর। এতে মুনাফিকরা তাকে তাচ্ছিল্য করে বলে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সা.) তোমার সদকার কোন দরকার নেই। তখন আল্লাহ্ তা'লা মুনাফিকদের তিরস্কার করে ও আবু আকীলের মত সাহাবীদের প্রশংসা করে আয়াত নাযিল করেন। তিনি-ই সেই আনসারী সাহাবী ছিলেন, যিনি মুসায়লামা কাযযাবের উপর শেষ আঘাতটি করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধের দিন তিনি-ই সর্বপ্রথম গুরুতর আহত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলমানরা পিছু হটছিল এবং হযরত মাআন বিন আদী (রা.) উচ্চস্বরে আনসারদেরকে পুনরায় আক্রমণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তখন তিনি তীব্র আঘাত সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ান ও যুদ্ধের ময়দানে চলে আসেন। অতঃপর আনসারদের আক্রমণে কাফেররা পিছু হটে ও পরাজিত হয়। হযরত ইবনে উমর দেখেন, আবু আকীল হাত-কাটা অবস্থায় চৌদ্দটি প্রাণঘাতি আঘাত নিয়ে মাটিতে পড়ে আছেন ঠিক মুসায়লামার পাশেই। তখনও আবু আকীলের মাঝে প্রাণ ছিল, ইবনে উমর গিয়ে তার অবস্থা জানতে চাইলে তিনি যুদ্ধের ফলাফল জানতে চান। যখন জানতে পারেন মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছে, তখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন ও আকাশের দিকে হাত উঠান এবং তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়।

হুযুর (আই.) দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা সকল সাহাবীর মর্যাদা উন্নত করুন। এরপর হুযুর দু'টি গায়েবানা জানাযার ঘোষণা দেন। প্রথমটি বাংলাদেশের মোকাররম মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেবের, যিনি ২৬ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযুর তার নাতিদীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেন। দ্বিতীয় জানাযা নানকানার শহীদ মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ সাহেবের, যাকে গত ২৯ আগস্ট তার স্বর্ণালংকারের দোকানে ডাকাতির পর ডাকাতরা গুলি করে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযুর উভয় মরহুমের উন্নত পদমর্যাদার জন্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য ধৈর্য ও মরহুমদের পুণ্যকে চলমান রাখার দোয়া করেন। আমীন।

[হুযুরের খুতবা সরাসরি ও সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই]